55

ভোরের কাগজ

তারিখ 14 MAY 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

উন্নয়ন চিত্র : খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্কুল-কলেজ

লতিফ সিদ্দিকী : পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সাংবার্ষিক উৎসব বলতে গেলে একটাই বিজু-বর্ষবরণ। আর চাকমাসহ বেশিরভাগ উপজাতীয় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে কঠিন চীবর দান ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো অনুষ্ঠিত হয় বছরের নানা সময়ে। তবে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশ বজায় রাখতে হয় বলে উৎসবের ভাবটা থাকে না সেসব অনুষ্ঠানে। বিজুই তাই একমাত্র উৎসব। গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম সেজে ওঠে উৎসবের সাজে।

এবারও তিন পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন সংগঠন আয়োজন করেছিল নানা উৎসব অনুষ্ঠানের। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দরিদ্র ও এতিম ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মোনঘর আবাসিক শিক্ষা কমপ্লেক্স রাঙ্গামাটিতে এবার আয়োজন করেছিল সেমিনার, নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলার। ১০ এপ্রিল শুরু হয় এদের অনুষ্ঠান। পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে শিক্ষাবিদ ভূমিত্র চাকমার লেখা প্রবন্ধ পাঠ করা হয় অনুষ্ঠানে। একটা চমৎকার তথ্য জানা যায় তার প্রবন্ধ থেকে।

প্রবন্ধের এক জায়গা ভূমিত্র চাকমা লিখেছেন 'পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার দিক দিয়ে খুব পিছনে পড়েছিল। ষাট দশকের প্রথম দিকে একটি ঘটনা শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধনকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এটি হলো কাপ্তাই বাঁধ (১৯৫৭-১৯৬২)। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে ২৫৩ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হয়।... ১০০০০ কৃষি পরিবার ও ৮০০০ জুমিয়া পরিবারের মোট ১ লাখ উদ্বাস্তু হয়।... ফলে পাহাড়িরা, বিশেষত ক্ষতিগ্রস্ত চাকমা সম্প্রদায় বেঁচে থাকার সংগ্রামের যে উপায় উপলব্ধি করলো তা হলো শিক্ষা। এরই বহিঃপ্রকাশ হলো চাকমাদের মধ্যে শিক্ষার দ্রুত বিস্তার।

তথ্যটি চমকে দেওয়ার মতো। কাপ্তাই বাঁধ পাহাড়িদের সব কেড়ে নিলেও সচেতন করেছে শিক্ষার ব্যাপারে। এই সচেতনতা অবশ্য সৃষ্টি হয়েছে মূলত চাকমাদের ভিতর এবং এদের দেখাদেখি মার্মাদের ভিতর কিছুটা। কিন্তু এখানকার বাদবাকি ১১টি উপজাতির শিক্ষাদীক্ষার হাল কি?

মার্মাদের পর ত্রিপুরাদের অবস্থান শিক্ষার হারের দিক থেকে। কিন্তু অন্যসব উপজাতির শিক্ষার হাল খুবই খারাপ।

মুরংদের অবস্থার মোটামুটি একটা চিত্র পাওয়া যায় পবলা হেডম্যান পাড়ার পরিস্থিতি থেকে। খোঁজ নিয়ে জানা যায় মুরংদের জন্য আলাদা একটা আবাসিক স্কুল আছে, বান্দরবান সদর থানার সোয়ালক ইউনিয়নে। ১৯৮০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় এ স্কুল। স্কুল চালানোর পুরো খরচের যোগান দেয় ইউনিসেফ।

কথা হলো স্কুলের প্রধান শিক্ষক নূরুল ইসলামের সঙ্গে। তিনি জানালেন মোট ২১৪ জন ছাত্রছাত্রী আছে এ স্কুলে। আসন সংখ্যা নির্ধারিত প্রতিবছর প্রথম শ্রেণী ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয় শুধু। তবে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অন্যসব শ্রেণীতে ড্রপ আউটের কারণে যেসব আসন শূন্য হয় তা পূরণ করা হয় নতুন ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে। গত বছর ড্রপ আউট হয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর ২৭ জন। এখানকার ছাত্রছাত্রী শিক্ষক কর্মচারী সবাই আবাসিক।

নূরুল ইসলাম বললেন উন্নয়ন বোর্ড আর ইউনিসেফের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী ইউনিসেফ এ বছর এ স্কুলের জন্য মোট বরাদ্দ দিয়েছে ৩০ লাখ টাকা।

এ বছর এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে মাত্র ২ লাখ টাকা। কোনো বছরই বার্ষিক বরাদ্দের পুরো টাকাটা পাওয়া যায় না। টাকার জন্য কর্মকর্তাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে ঘুরতে প্রাণান্তকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। নানান ঘাপলায় আটকে যায় বরাদ্দ। মিটিঙে পাস হয় তো ডিসি সাহেবের সই করতে সময় লাগে, আবার ডিসি সাহেব সই করেন তো অন্য কোনো সইদাতার বিলম্ব হয়। এপ্রিলের ১৯ তারিখে কথা হয় নরুল ইসলামের সঙ্গে। বললেন শিক্ষকদের বেতন বাকি তিনমাসের। ছাত্রছাত্রীদের বইপত্র পাওয়া যায়নি আজো। খাবার দাবার সরবরাহ করেন যে ঠিকাদার তারও বিল বাকি ম্যালা।

হলঘরের মধ্যে হাসপাতালের বেডের মতো পাশাপাশি চৌকিপাতা। এখানে বাস করে ছাত্রছাত্রীরা। ঘিঞ্জি পরিবেশ। শব্দ করে সবাই একসঙ্গে পড়তে শুরু করলে বাইরে থেকে এটাকে হাটবাজার জাতীয় কিছু মনে হবে নির্ঘাত। ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য আলাদা থাকার ব্যবস্থা। মলিন জামা কাপড় সবার। বিছানা পত্রেরও একই দশা।

কথা হলো ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। ৪র্থ শ্রেণীর পড়ুয়া র‍্যাংলের বাড়ি রুমায়। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে তাকে এ স্কুলে পড়বার বাসনায়। তৃতীয় শ্রেণীর নিয়াকিতের বাড়ি থানাচিতে। ১ম শ্রেণীর ছোট ম্যানরাও বাংলা অক্ষর চেনে না এখনও। আদতে সে চেনে না কোনো অক্ষরই। স্কুলে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ভাষা একটা সমস্যা বটে। শিক্ষকদের বেশির ভাগই বাঙালি। তাদের কারো বাড়ি ফেনী কারো গোপালগঞ্জে কারো বা অন্য কোথাও মুরংদের ভাষা এদের অধিকাংশেরই অজানা। শরীরের ভাষায় কথা বলেন শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে।

কয়েকটি বেসরকারি সংগঠন যেমন সিসিডিবি, ওয়ার্ল্ডভিশন, কারিতাস ইত্যাদি অনগ্রসর উপজাতি শিশুদের লেখাপড়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এদের কাজকর্মেই বরং আন্তরিকতা বেশি। কারিতাস বান্দরবান শহরে একটা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালাচ্ছে। প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি রয়েছে প্রায় সব সংগঠনেরই কিন্তু কতোখানিই বা দূর হয় তাতে অশিক্ষার অন্ধকার।

৯৬১৮৮০ জনসংখ্য অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে কলেজ আছে মোট ৯টি, হাইস্কুল আছে ৭৮টি আর প্রাইমারি স্কুল ১১৭৩টি। এ হিসেব গত বছরের। এর মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে বহু স্কুল। বন্ধ হওয়ার পথে বসেছে অনেক স্কুল। ওপরের পরিসংখ্যানে নিশ্চয়ই এসব স্কুলও আছে। আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে একজন করে শিক্ষক নিয়ে চালু আছে এ রকম স্কুলের সংখ্যাই বেশি। সরকারি কলেজগুলো শিক্ষক সঙ্কটে দিশেহারা। পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনো কলেজে কোনো শিক্ষককে বদলি করা হলে সেই শিক্ষক তদবির শুরু করেন ওপর মহলে বদলির আদেশ বাতিল বা সমতলের কোনো কলেজে তাকে বদলি করানোর জন্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চেষ্টা সফল হয়। খাগড়াছড়ি জেলার ভাইবোন ছড়া ইউপির তরুণ চেয়ারম্যান শক্তিপদ ত্রিপুরা বলেন পার্বত্য জনপদে শিক্ষার চিত্র বড়োই করুণ। শিক্ষকের অভাবে একের পর এক স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সরকার নজর দিচ্ছে না এদিকে। খাগড়াছড়ির একমাত্র সরকারি কলেজটিতে শিক্ষকের সঙ্কট প্রকট। এখানকার ইংরেজি বিভাগে পুরো একবছর কোনো শিক্ষক ছিল না। এখন আছেন একজন মাত্র। গোলাম ফারুক ইংরেজি বিভাগের এই সংবেদন নীলমণির নাম।

আলুটিলার পুনর্বাসিত জুমচাষী গোপাল ও আদিনাথ বলেছেন তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাহীনতার কথা। একটা স্কুল ছিল তাদের পুনর্বাসন এলাকায়। এখন নেই। ওঠে গেছে।

এইভাবে বেড়ে উঠছে পাহাড় জনপদের অবহেলিত উপজাতির সন্তানেরা। এদের নেতারা যদি বলেন যে পাহাড়িদের প্রতি চরম বৈষম্য দেখানো হচ্ছে শিক্ষার ক্ষেত্রে- তাহলে তা খুব একটা মিথ্যে বলা হবে না।